দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 12 JAN 2017
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

শিশু শিক্ষার বই বিতর্ক ও সমাজ গবেষণা

স্বদেশ রায়

শিশু শিক্ষার বই যেভাবে তৈরি করা হয়েছে এ নিয়ে দ্রুত কোন মন্তব্য করা কঠিন। সকলের চোখ এড়িয়ে এমন একটা বিষয় শিশুদের হাতে যাবে, এ কথা বালকও বিশ্বাস করবে না। তা ছাড়া যারা এই বই উৎসব করেছেন, তারা একবারও এ বইয়ের পাতা উল্টে দেখেননি এমনই বা মানুষ কেন বিশ্বাস করবে! তার পরে গত কয়েক বছরে বিশ্বজুড়ে যা চলছে এখানেও সেই একই ঘটনা ঘটেছে। পাঠ্যবইয়ে যে এসব আছে, এ সংবাদটি নিয়মিত মিডিয়া ব্রেক করতে পারেনি। ব্রেক করেছে সোশ্যাল মিডিয়া। শুরু থেকে সোশ্যাল মিডিয়া বেশ ভালভাবে লক্ষ্য করেছি, সেগুলোর সার্বিক বিচার করে মনে হয়েছে, যারা এর বিরুদ্ধে সোচ্চার তারা অতি ছোট একটি গোষ্ঠী। তারা এ নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই। কারণ পৃথিবীতে এটাই সত্য, সব দেশে, সব সময়ে উদার গণতান্ত্রিক শক্তি খুবই ছোট হয়। যে কোন রূপে এক ধরনের ফ্যানাটিক, মৌলবাদী এবং কাল্টবাদীরাই বড় গোষ্ঠী হয়ে থাকে। কারণ সব ধরনের চিন্তাকে নিজের ভেতর নিয়ে তাঁর থেকে ভালটা বেছে নেয়ার মতো শক্তি খুব কম মানুষের থাকে। যেমন এবার এই শিশু শিক্ষার বইয়ের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, গণজাগরণ মঞ্চও কোন প্রতিবাদ করেনি। যারা সব সময় প্রগতিশীলতার পক্ষে থাকে। তাই এখানে প্রকৃত প্রতিবাদকারী হচ্ছেন একমাত্র যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রতিবাদ করছেন তারা। এর থেকে বোঝা যায় প্রকৃত উদার গণতান্ত্রিক শক্তি কত ছোট। আর নিয়মিত মিডিয়াকে এখানে এতটা কৃতিত্ব দেয়া যাবে না এ কারণে, তারা এখন যে নিউজ করছে এর একটা বড় কারণ, সোশ্যাল মিডিয়ার কাছে তারা হেরে গেছে বলেই এখন নিজেদের অবস্থান টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে।

একটি সমাজে শিশুদের হাতে যখন এ ধরনের ধর্মান্ধতার ওপর ভিত্তি করে বই দেয়া হয় তখন ওই সমাজ নিয়ে গবেষণা করা একান্ত প্রয়োজন। যদিও আমাদের কৃষি ক্ষেত্র ছাড়া খুব একটা গবেষণা অন্য ক্ষেত্রে হচ্ছে না। তার পরেও বলা যায় প্রকৃত অর্থে সমাজ গবেষণা একেবারেই নেই বললেই চলে। এদিকে ব্রিটিশ চলে যাওয়া, পাকিস্তান শেষ হয়ে যাওয়া ও বাংলাদেশ সব মিলিয়ে ৭০ বছরে পা দিয়েছি আমরা। ৭০ বছরে একটি সমাজে অনেক পরিবর্তন ঘটে, সে পরিবর্তনকে পুঙ্খানুপুঙ্খ না জেনে ওই সমাজ সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়া খুবই কঠিন। আর এই সমাজ সম্পর্কে না জেনে একের পর এক সিদ্ধান্ত নেয়া হচ্ছে বলেই তার কুফলগুলো আমরা সমাজে দেখতে পাচ্ছি। অর্থাৎ সমাজের অন্যতম উপাদান রাজনীতি আজ অনেকাংশে দুর্বৃত্তদের হাতে। শিল্পায়নের থেকে শিল্পায়নের নামে পাবলিক মানির নয়-ছয়ই বেশি হচ্ছে। রাষ্ট্রের প্রতিটি অঙ্গ দুর্বল হয়ে পড়ছে। সংবিধানের মৌলনীতিগুলোকে রাষ্ট্রের এমন এমন স্থান থেকে নষ্ট করার চেষ্টা চলছে তা ভয়ঙ্কর ভবিষ্যতের ইঙ্গিত। এমনকি সংবিধান সবটুকু না মেনেও দেশে রাজনীতি করছে অনেক রাজনৈতিক দল, তাদের জনপ্রিয়তাও কম নয়। কোন কোন রাজনৈতিক দল প্রকাশ্যে সংবিধানের মূল চরিত্র বদল করার কর্মসূচী দিয়ে নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে। অন্যদিকে শিক্ষার মান প্রতিদিন নেমে যাচ্ছে। সত্যিকার অর্থে আন্তর্জাতিক মান তো দূরে থাকুক এশীয় মানের গ্রাজুয়েটও দেশে তৈরি হচ্ছে না। তাছাড়া শিক্ষার ভেতর দিয়ে এমন একটি শ্রেণী বের হয়ে আসছে না- যে শ্রেণী জাতির জন্য যুগোপযোগী সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন আনবে এবং ওই পরিবর্তনের নেতা হবে। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন করার যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষিত শ্রেণী তৈরি করতে পারছে না সমাজ ও রাষ্ট্র। ফলে সমাজের নেতৃত্ব চলে যাচ্ছে, প্রাচীন সভ্যতার চিন্তা-চেতনার দিকে। যার ফলে সমাজ ক্রমেই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে তথাকথিত ধর্মীয় চেতনা দিয়ে। সমাজ যে চেতনা দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হবে ওই সমাজের সব কিছুতে তার প্রভাব পড়বে। তাই শিশু শিক্ষার বই এ সমাজে এমন হলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। বরং বলা যায়, সমাজ যেভাবে চলছে তাতে এমন বই শিশুদের হাতে যাওয়া অতি স্বাভাবিক ঘটনা এবং এখানে প্রতিবাদকারীর সংখ্যাও অতি কম হবে। বাস্তবে যদি সত্যি অর্থে এই অবস্থা থেকে রাষ্ট্র ও সমাজকে বের করতে হয় তাহলে এখন সব থেকে বড় প্রয়োজন ব্যাপক সমাজ গবেষণা। নির্ণয় করা দরকার সমাজ এখন কোথায় আছে। এই নির্ণয়টি সঠিক হলে রাজনীতিতে, রাষ্ট্রের সব জায়গায় সঠিক সিদ্ধান্ত আসবে। আর রাজনীতি ও রাষ্ট্রের সঠিক সিদ্ধান্ত না এলে আগামীতে আরও অন্ধকারময় সময় আসবে। শুধু বইয়ে আর পোশাকে নয় তখন অনেক কিছুতে পরিবর্তন হবে। কারণ ১৯৪৭ থেকে ২০১৭ এই ৭০ বছরে যদি আমাদের সমাজের দিকে অতি সাধারণ চোখে তাকানো হয় তাহলে দেখা যাবে সমাজের সব থেকে বড় পরিবর্তন হয়েছে বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসী জনগোষ্ঠীর সংখ্যার দিক থেকে। এখন সত্যি অর্থে প্রায় একটি একক ধর্মবিশ্বাসী জনগোষ্ঠীর সমাজে পরিণত হয়েছে বাংলাদেশ। একটি একক ধর্মবিশ্বাসী জনগোষ্ঠীর সমাজ কীভাবে পরিচালিত হবে, তার সংস্কৃতি কী হবে সে সম্পর্কে এ দেশের রাজনীতিবিদ বা সিভিল সোসাইটির প্রকৃত কোন ধারণা নেই। কারণ ১৯৪৮ থেকে ষাটের দশক অবধি ধীরে ধীরে যে বাঙালী সংস্কৃতিনির্ভর জাতীয়তা গড়ে উঠেছিল ওই সমাজ কিন্তু একক ধর্মবিশ্বাসীদের সমাজ ছিল না। সেখানে ২৫ ভাগের বেশি হিন্দু ধর্ম বিশ্বাসী ছিল, বৌদ্ধ ছিল, খ্রীস্টান ছিল, এমনকি নাস্তিকও ছিল। তখন এ সমাজে কোন ধর্মে বিশ্বাসী না থাকাটা দোষের ছিল না। স্বাভাবিকভাবে সমাজ ছিল বহুত্ববাদী একটি সমাজ, এখন প্রায় একক একটি সমাজ। বহুত্বকে নিয়ে যে আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতির জাতীয় চেতনা গড়ে উঠেছিল সেই চেতনা বর্তমানের এই প্রায় একক সমাজে কতটুকু কার্যকর হবে? আবার নতুন করে কী ধর্মীয় চেতনায় সমাজ গঠিত হবে না ভূমি থেকে উৎসারিত চেতনার সঙ্গে আধুনিক পৃথিবীর চেতনা মিলিয়ে তৈরি সংস্কৃতি দ্বারা এ সমাজ চালিত হবে তা এখন অনেক বড় প্রশ্ন- এই রাষ্ট্র ও সমাজের জন্য। এমনকি এই সত্যও স্বীকার করতে হবে, যে জাতীয়তাবাদের চেতনায় বাংলাদেশ সৃষ্টি হয়েছে ওই চেতনা সৃষ্টির পেছনে বেঙ্গল রেনেসাঁর একটা প্রবহমান ধারা ছিল। কারণ বেঙ্গল রেনেসাঁর ফসল সব থেকে প্রাণে বেশি ধারণ করেছিল শিক্ষিত হিন্দু ও এস ওয়াজেদ আলী থেকে শুরু করে কাজী আবদুল ওদুদের মতো একটা মুসলিম গোষ্ঠী। যে কারণে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ যেমন বাংলা ভাষা আন্দোলনের তাত্ত্বিক গুরু তেমনি ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত পাকিস্তান পার্লামেন্টের মাধ্যমে বাংলা ভাষা আন্দোলন শুরু করেন। কিন্তু এখন এই সমাজের দিকে তাকালে মোটা দাগে দেখা যাচ্ছে, বেঙ্গল রেনেসাঁর ধারক উচ্চবর্ণের শিক্ষিত হিন্দু শ্রেণীর প্রায় সকলেই বাংলাদেশ ত্যাগ করেছেন। অন্যদিকে এস ওয়াজেদ আলী, কাজী আবদুল ওদুদ ও ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এখানে অবশ্য রাজনীতিবিদদের সঙ্গে সিভিল সোসাইটির একটি পার্থক্য থাকে। সিভিল সোসাইটি খরগোশের গতিতে এগোতে চায়, রাজনীতিকরা হাতির গতিতে এগোতে চায়। এর কারণ দুটোর শরীরের আকৃতির পার্থক্য। সিভিল সোসাইটির শরীর ছোট হয়, সেখানে ময়লা থাকে না। রাজনীতিকদের বড় শরীর ও সমাজের অনেক ময়লাকে সঙ্গে নিয়ে চলতে হয়। এ জন্য রাজনীতিকদের আপোস করতে হয় এবং ধীরগতিতে সমাজ পরিবর্তন করতে হয়। কিন্তু প্রশ্ন হলো, কোথায় আপোস করা হবে ও কোথায় করা হবে না? যেমন ধরা যাক, একজন মেডিসিন স্পেশালিস্ট, যিনি সহজে এ্যান্টিবায়োটিক লেখেন না। সাধারণ জ্বর হলেই তিনি প্যারাসিটামল দিয়ে জ্বর সারিয়ে তোলেন। কিন্তু যখন তিনি নিউমোনিয়ার লক্ষণ দেখেন তখন দিনে দুই হাজার মিলিগ্রাম এ্যান্টিবায়োটিক দেন। তাই রাজনীতিবিদদের নিউমোনিয়াটা চিনতে হবে। সবকিছু প্যারাসিটামল দিয়ে সারা সম্ভব নয়। রাজনীতিবিদরা যদি মনে করেন, প্রাচীন সভ্যতার আচরণের পক্ষে বেশি মানুষ তাই তাদের সঙ্গে আপোস করে পাঠ্যসূচী তৈরি করব তাহলে তা কিন্তু প্যারাসিটামল দিয়ে নিউমোনিয়া চিকিৎসা হবে। শেষ পর্যন্ত রোগী মারা যাবে। শিক্ষা সব সময়ই আধুনিক। প্রাচীন কোন সভ্যতার সঙ্গে মিলিয়ে শিক্ষা প্রচলন করলে তা হবে প্যারাসিটামল দিয়ে নিউমোনিয়া চিকিৎসা। ডাক্তারের হাতে হয়ত একজন নিউমোনিয়ার রোগী মারা যায়, আর শিক্ষা নিয়ে আপোস করলে রাজনীতিকদের হাতে মারা যাবে ভবিষ্যত প্রজন্ম।

swadeshroy@gmail.com

১৯৪৭ থেকে ২০১৭ এই ৭০ বছরে যদি আমাদের সমাজের দিকে অতি সাধারণ চোখে তাকানো হয়, তাহলে দেখা যাবে সমাজের সব থেকে বড় পরিবর্তন হয়েছে বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসী জনগোষ্ঠীর সংখ্যার দিক থেকে। এখন সত্যি অর্থে প্রায় একটি একক ধর্মবিশ্বাসী জনগোষ্ঠীর সমাজে পরিণত হয়েছে বাংলাদেশ। একটি একক ধর্মবিশ্বাসী জনগোষ্ঠীর সমাজ কীভাবে পরিচালিত হবে, তার সংস্কৃতি কী হবে সে সম্পর্কে এ দেশের রাজনীতিবিদ বা সিভিল সোসাইটির প্রকৃত কোন ধারণা নেই

শিক্ষা সব সময়ই আধুনিক। প্রাচীন কোন সভ্যতার সঙ্গে মিলিয়ে শিক্ষা প্রচলন করলে তা হবে প্যারাসিটামল দিয়ে নিউমোনিয়া চিকিৎসা। ডাক্তারের হাতে হয়ত একজন নিউমোনিয়ার রোগী মারা যায়, আর শিক্ষা নিয়ে আপোস করলে রাজনীতিকদের হাতে মারা যাবে ভবিষ্যত প্রজন্ম